জাতীয় বাজেট ২০২৫-২০২৬ ও নাগরিক সমাজের প্রেক্ষিত

জিডিপি'র ০.৬৭% জলবায়ু বরাদ্দ অপর্যাপ্ত ও অগ্রহণযোগ্য; পাচারকৃত অর্থ ফিরিয়ে এনে বাজেট ঘাটতি পূরণের উদ্যোগ জরুরি

১. প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেট ২০২৫-২৬

'বৈষম্যহীন ও টেকসই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ার প্রত্যয়' স্লোগানে গত ২ জুন ২০২৫, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তবর্তী সরকারের অর্থ উপদেষ্টা টিভিতে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য ৭ লাখ ৯০ হাজার কোটি টাকার বাজেট ঘোষনা করেছেন, যা চলতি অর্থবছরের চেয়ে ৭ হাজার কোটি টাকা কম। রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৫ লাখ ৬৪ হাজার কোটি টাকা। যা চলতি অর্থবছরের চেয়ে ২৩ হাজার কোটি টাকা বেশি। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আকার ধরা হয়েছে ২ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকা। যা চলতি অর্থবছরের চেয়ে ৩৫ হাজার কোটি টাকা কম।মূল্যস্ফীতি ৯/১০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৬ দশমিক ৫ শতাংশ রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে, বর্তমানে দেশে মূল্যস্ফীতি ৯ থেকে ১০ শতাংশে বিরাজ করছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন,এবারের বাজেটে কিছু ভালো উদ্যোগ বা প্রত্যাশার কথা থাকলেও বাজেট কাঠামো গতানুগতিক ধারার, পুঞ্জীভূত সমস্যাগুলো রয়েই গেছে। অথচ সরকারের সামনে ভিন্নধর্মী বাজেট উপস্থাপনের সুযোগ ছিল।

২. বেড়েছে দেশি-বিদেশি ঋণ সুদ পরিশোধের ব্যয়

আগামী অর্থবছরের দেশি-বিদেশি ঋণের সুদ বাবদ মোট ১ লাখ ৮৭ হাজার কোটি টাকা পরিশোধের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি চলতি অর্থবছরে সুদ পরিশোধে ব্যয় ১ লাখ ১৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকা, যা আগামী অর্থবছরে আরও ২০ হাজার কোটি টাকা বেড়ে দাঁড়াবে ১ লাখ ৩৩ হাজার কোটি টাকারও বেশি, যা প্রস্তাবিত বাজেটের প্রায় ১৬.৮%, অর্থনীতিবীদদের মতে, ঘাটতি বাজেট অর্থনৈতিক বিচারে নিয়মবহির্ভূত নয়, তবুও ঘাটতি অর্থায়ন সীমিত রাখা মূল্যস্ফীতি রোধ ও প্রকৃত খরচের সংকুলান করার জন্য প্রয়োজন। প্রতিবছরের বাজেটে একটি বড় অঙ্কের টাকা চলে যায় ঋণের সুদ ও আসল পরিশোধ করতেই, ফলে বাজেট বরাদ্দের বড় একটি অংশ প্রত্যক্ষভাবে জনকল্যাণে আসে না।

৩. মন্দার বাজারে মূল্য মুদ্রাস্ফীতির সাথে বেড়েছে করের চাপ

এক কথায় বলা যায় প্রতিবারের মতো এবারের বাজেট ও জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন হয়নি, হয়েছে উপনিবেশিক কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের ইচ্ছার প্রতিফলন। বাজেটের আকার গত বছরের তুলনায় সাত হাজার কোটি টাকা কম হলেও এনবিআর কে দেয়া হয়েছে ৪.৯৯ লক্ষ কোটি টাকার টার্গেট যা গত বছর থেকে প্রায় ১৯ হাজার কোটি টাকা বেশি, এটা মোট আয়ের লক্ষ্যমাত্রার ৮৮ দশমিক ৪৭ শতাংশ। এই টার্গেট অর্জনে বরাবরের মতো এবার ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড পরোক্ষ করের উপর জোর দিয়েছে, ইতি মধ্যে প্রায় সবক্ষেত্রেই ভ্যাটের হার দ্বিগুণ করা হয়েছে, যেসকল পণ্য বা সেবার উপর ভ্যাট মকুফ বা স্বল্প হার ছিল বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সেই সুবিধা উঠিয়ে দেয়া হয়েছে। যার সরাসরি প্রভাব পড়ছে আপমর জনসাধারণের উপর বিশেষ করে মধ্যভিত্ত শ্রেনীর উপর। অর্থনীতিবিদদের মতে ১% পরোক্ষ কর বাড়লে ০.৪২% দারিদ্রতা বাড়ে।

উচ্চ মূল্যস্ফীতির এই সময়ে ব্যক্তিশ্রেণির করদাতাদের বার্ষিক করমুক্ত আয়সীমা বাড়েনি, আগের মতোই সাড়ে তিন লাখ টাকা অপরিবর্তিত থাকছে। তবে ২০২৬-২৭ ও ২০২৭-২৮ অর্থবছরে বার্ষিক করমুক্ত আয়সীমা প্রস্তাব করা হয়েছে তিন লাখ ৭৫ হাজার টাকা। সেখানেও রয়েছে শুভঙ্করের ফাঁকি, কারন এইক্ষেত্রে সরকার সাতটির জায়গায় ছয়টি ধাপে করহার প্রস্তাব করেছেন,পরবর্তী তিন লাখ টাকা আয়ে কর দিতে হবে ১০ শতাংশ হারে, যা পূর্বে ছিল ১ লক্ষ টাকার উপর ৫%। সর্বোচ্চ করহার আগের মতো ৩০ শতাংশ রাখা হলেও আগের ধাপগুলোর সীমা কমিয়ে আনায় গত বছরের সমান আয় করেও বেশি হারে কর দিতে হবে অনেক করদাতাকে। নতুন হার অনুযায়ি একজন করদাতার মাসিক আয় ১ লক্ষ টাকা হলে তাকে আগের চেয়ে প্রায় ১২ হাজার টাকা বেশি ট্যাক্স দিতে হবে। নুন্যতম কর ৩০০০ তাকা থেকে বাড়িয়ে ৫০০০ করার প্রস্তাব করা হয়েছে এর ফলে স্বল্প আয়ের মানুষ কর প্রদানে বিমুখ হবে,কর ফাঁকি বেড়ে যাবে। দেশে প্রায় ১.৩ মিলিয়ন ই-টিন ধারি থাকলেও এই বছর ও মাত্র ৪৫ লক্ষ রিটার্ন জমা পড়েছে। দেশের ধনী ১০ শতাংশ মানুষের হাতেই এখন দেশের মোট আয়ের ৪১%। অন্যদিকে সবচেয়ে গরিব ১০% মানুষের আয় দেশের মোট আয়ের মাত্র ১.৩১%। প্রতি বছর সম্পদ কর থেকেই দেশ প্রায় ৬০০০ কোটি টাকা হারাচ্ছে। যা দিয়ে দেশের স্বাস্থ্য খাতে বার্ষিক জাতীয় বাজেট বরাদ্দে প্রায় ১৫% পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যেতে পারে। পাশাপাশি, শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ ৬.৫% এবং সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ৫% পর্যন্ত বৃদ্ধি সম্ভব।

৪. এবারও থাকছে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ

কালোটাকা সাদা করার সুযোগ অব্যাহত রাখার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে এবারও। যাদের মুল উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রসংস্কার, তারা এখন দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান থেকে সরে এসে সংস্কারের মূল উদ্দেশ্যকে রীতিমতো উপেক্ষা করে দুর্নীতিবাজদের কাছে রীতিমত আত্মসমর্পণ করেছেন। ক্যাপিটেল ফ্লাইট, ওভার ইনভয়েসিং এবং আন্ডার ইনভয়েসিং এর মাধ্যমে দেশ থেকে প্রতি বছর হাজার হাজার কোটি টাকা চলে যাচ্ছে সেই ব্যাপারে বাজেটে সুনির্দিষ্ট কোন প্রস্তাবনা দেখা যায়নি। বিগত বছর গুলোতে যে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার পাচার হয়েছে ১০মাস পার হয়ে গেলেও সেগুলো ফিরিয়ে আনার বিশেষ কোন অগ্রগতি আমরা দেখতে পাইনি, বরং নতুন করে এখন দুর্নীতির ডাল পালা গজাচ্ছে। সরকার আগের মতো সেই বৈদেশিক ঋণের দিকেই ঝুঁকছে আর আমদের ঘাড়ে করের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে।

৫. বাজেটের ঘাটতি পূরণে অর্থ পাচার রোধ ও পুনরুদ্ধার জরুরী

আমরা জেনেছি যে, ২০০৯-২০২৩ এই ১৫ বছরে দেশ হতে ২৩ হাজার ৪০০ কোটি ডলার (২৮ লাখ কোটি টাকা) বিদেশে পাচার হয়েছে যা প্রতিবছর গড়ে ১ লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকা। সম্প্রতি প্রকাশিত শ্বেতপত্র অনুযায়ী প্রতিবছর মোট জিডিপি'র ৩.৪% পরিমাণ অর্থ পাচার হয়েছে। আর এই পাচারের প্রায় ৮০% হয়েছে বাণিজ্যের আড়ালে। মূলত স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, দুর্বল শাসন ব্যবস্থা, নজরদারি সংস্থাগুলোর সমন্বয়হীনতা, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি, আর রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবের কারণে এই টাকা পাচার হয়েছে। [দৈনিক ইত্তেফাক, ০২ ডিসেম্বর ২০২৪] আমরা মনে করি বর্তমান সরকার, বিশ্ব ব্যাংক এবং আইএমএফ-এর এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য এই বাজেটে বিভিন্ন প্রকার কর (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর) হার ও এর আওতা বাড়াতে যাচ্ছে, বিশেষ করে প্রায় সকল ক্ষেত্রে ভ্যাটের হার বাড়িয়ে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দ্বিগুন করে ১৫% করা হচ্ছে এবং এর ফলে দরিদ্র, নিম্ন মধ্যবিত্ত ও সাধারন মানুষের জীবন যাত্রা ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। অথচ এই আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো কখনো কোন সরকারকে পাচারকৃত অর্থ ফিরিয়ে আনার কথা বলে না। তাই আমরা মনে করি পরোক্ষ কর বিশেষ করে ভ্যাট হার না বাড়িয়ে পাচারকৃত অর্থের কমপক্ষে ৮ % ও যদি আদায় করা যায় তবে এই বাজেট ঘাটতি মোকাবেলা করা সম্ভব।

৬. বদলেছে অর্থপাচারের গতিপথ; পাচার রোধে তদন্তকারী সংস্থাগুলোর নিজেদের মধ্যে সমন্বয় জরুরী

কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে অর্থ পাচার বন্ধ করা যাচ্ছে না। একসময় বাংলাদেশ থেকে অর্থপাচারের জনপ্রিয় গন্তব্য ছিল সুইজারল্যান্ড, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, মালয়েশিয়া, কানাডাসহ করস্বর্গ খ্যাত কিছু দ্বীপরাষ্ট্র। তবে গত কয়েক বছরে এদেশেগুলোর উপর নজরদারি থাকায় অর্থপাচারের গন্তব্য বদলে বর্তমানে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইসহ মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বা পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে যাচ্ছে। বর্তমান সরকার কর্তৃক প্রত্যাশিত শ্বেতপত্র অনুযায়ী দুবাইয়ে বাংলাদেশিদের ৫৩২টি বাড়ি বা সম্পদ আছে, যার মূল্য সাড়ে ৩৭ কোটি ডলার এবং ২০২৪ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ৩,৬০০ বাংলাদেশি মালয়েশিয়ায় সেকেন্ড হোম কর্মসূচিতে মনোনীত হয়েছেন। [ইত্তেফাক, ০২ ডিসেম্বর ২০২৪]

বর্তমানে অর্থপাচার প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে দুদক সহ ৭টি সংস্থা কাজ করছে। বিদ্যমান মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের ২৭টি সম্পৃক্ত অপরাধের মধ্যে দুদক শুধুমাত্র 'ঘুষ ও দুর্নীতি'র মাধ্যমে অপরাধলব্ধ অর্থের মানি লন্ডারিংয়ের অনুসন্ধান ও তদন্ত করছে, আর বাকি ২৬টি সম্পৃক্ত অপরাধের তদন্তভার সিআইডি, এনবিআরসহ অন্য সংস্থাগুলোর কাছে ন্যাস্ত। তাই এদের মধ্যে সমন্বয় থাকলে এবং এরা একযোগে কাজ করলে এই পাচার অনেকাংশে কমে

যাবে বলে আশা করা যায়। পাশাপাশি সরকার যদি পাচারকৃত দেশগুলোর সাথে দ্বিপক্ষীয় আইনি সহায়তা চুক্তি করে তবে এর মাধ্যমে অর্থপাচার যেমন কমবে তেমনি পাচারকৃত অর্থ ফিরিয়ে আনা অনেকাংশে সহজ হবে।

৭. আর্থ-সামাজিক বৈষম্য টেকসই অর্থনীতির প্রতিফলন ঘটাতে পারে না

একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন এবং দারিদ্রতা হ্রাসের প্রধান সুচক হচ্ছে আর্থ-সামাজিক বৈষম্য হ্রাস পাওয়া এবং এই সূচকে সাফল্য পেতে হলে সরকারকে শিক্ষা,স্বাস্থ্য, কৃষি, পানি ও পয়নিষ্কাশন কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার মতো গুরত্বপূর্ণ দরিদ্রবান্ধব খাতগুলোতে গতানুগতিক ধারার পরিবর্তে কাংখিত মাত্রার বরাদ্দের প্রয়োজন যা করা হয়নি। আর্থ-সামাজিক বৈষম্য ক্রমান্বয়েই বাড়ছে এবং সরকারকে প্রতি বছর কথিত "সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসুচি" এর মত খাত সৃষ্টি করে দারিদ্রতা সামাল দিতে হচ্ছে। প্রস্তাবিত বাজেটে বর্তমান ১৪০টি কর্মসূচির পরিবর্তে ১০০টির নিচে কর্মসূচিতে সরকার প্রায় ৯৫ হাজার ৯০৮ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রেখেছে, যা মোট বাজেটের ১২.১৮% ।দেশের বিপুলসংখ্যক তরুণ কর্মসংস্থানের বাইরে, বিভিন্ন গবেষনা বলছে, এই মুহুর্তে শিক্ষিত বেকারের হার অন্তত ২০%, বিগত বছরের ছয় মাসে ৪% শ্রমিক চাকরি হারিয়েছে। চাকরি, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে নেই শ্রমশক্তির অন্তত ৩০% এবং দেশের প্রায় ৪ কোটির বেশি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে। ফলে দেশে ব্যাপকভাবে কর্মসংস্থানের যে প্রত্যাশা ছিলো বাজেটে সেভাবে মনোযোগ দেওয়া হয়নি। অর্থ-উপদেষ্টার বাজেট বক্তব্যে কর্মসংস্থানের সামান্য তহবিল, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রকল্প এবং প্রশিক্ষণের উদ্যোগের কথা বলা হলেও শিক্ষা, স্বাস্থ্য ,কৃষি ও স্যানিটেশন খাতে বাড়তি নজর দেওয়া হয়নি। আগেও যেমন বরাদ্দ দেওয়া হতো, এবারও তেমন।

৮. টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জলবায়ু অর্থায়নের প্রাসঙ্গিকতা

বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই [UN-ECOSOC] নির্ধারিত আর্থিক ও পরিবেশগত মানদন্ড অর্জন করে নিম্ন আয়ের দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ইকোসক এর নির্ধারিত পরিবেশগত মানদন্ড অর্জনের ক্ষেত্রে কতটা বাস্তবতার উপর এবং কতটা পরিসংখ্যানিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে অর্জিত হয়েছে। ইকোসক এর পরিবেশগত ঝুঁকি সূচকের যে ৪টি মানদন্ড রয়েছে সেগুলো হচ্ছে উপকূলীয় এলাকায় অধিক ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় বসবাসরত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা, খরা প্রবন অঞ্চলে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা, কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার অস্থিতিশীলতার মাত্রা এবং দুর্যোগের শিকার হয় বা হতে পারে এমন জনগোষ্ঠীর সংখ্যা।

বাংলাদেশের প্রায় ২৫ মিলিয়ন জনগোষ্ঠী উপকূলীয় অঞ্চলের অধিক ঝুকিঁপুর্ন এলাকায় বাস করে। যদিও বলা হয় উপকূলের সুরক্ষায় পর্যাপ্ত বাঁধ রয়েছে কিন্তু বাস্তবতায় প্রায় ৭০-৮০% বাঁধই দুর্যোগ মোকাবেলায় অনুপোযোগী। আন্তর্জাতিক খাদ্য নীতি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (IFPRI) প্রতিবেদন কলছে, উপকূলের প্রায় ১.৫ মিলিয়ন হেক্টর জমি লবণাক্ততার সংকটে রয়েছে, কার্যযকর উদ্যোগ নিতে না পারলে, কৃষি আয় বার্ষিক ২১% হ্রাস পাবে। আইপিসিসি'র অনুমান বলছে, ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ ৩০% খাদ্য উৎপাদন হারাতে পারে। ১৯টি উপকূলীয় জেলার মধ্যে ১৮টি জেলার শতাধিক উপজেলায় বর্তমানে সুপেয় পানির সংকট তীব্র আকার ধারন করেছে। আইডিএমসি'র প্রতিবেদন-২০২৫ বলছে এক বছরের ব্যবধানে বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের মতো দুর্যোগে বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৬ লাখ, দেশে বর্তমানে বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা প্রায় ২৪ লাখ। জাতিসংঘের গবেষনা প্রতিবেদন বলছে, বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ে বাংলাদেশে প্রতি বছর ৩২০ কোটি ডলার বা ২৫ হাজার ৬০০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়, যা মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ২.২%। এই ধরনের ক্ষয়-ক্ষতির চিত্র টেকসই উন্নয়নকে প্রতিফলন করে না। এই পরিংখ্যান ভিত্তিক অর্জন জাতিসংঘের মানদন্ডে অর্জিত হলেও বাস্তবাতর প্রেক্ষিতে কোটি কোটি জনগোষ্ঠীকে অরক্ষিত ও ঝুঁকিপূর্ন অবস্থায় রেখে টেকসই উন্নয়ন কতটা সম্ভব সেটাও যথেষ্ট বিবেচনার দাবি রাখে।

৯. সরকারের জলবায়ু অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি ও বাজেট বরাদ্দের চিত্র

জলবায়ু খাতের জন্য বাজেট বরাদ্দ মোটেই পরিকল্পিত ও পর্যাপ্ত নয়। নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় পর্যাপ্ত জলবায়ু অর্থবরাদ্দের দাবি করা হলেও বরাদ্দ তো বাড়েইনি উল্টো কমেছে। ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বাজেটে জলবায়ু সংশ্লিষ্ট ২৫টি মন্ত্রণালয়সমূহের জলবায়ু বরাদ্দ দেয়া হয়েছিলো ৪২ হাজার ২শত ০৬ দশমিক ৮৯ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ১০.০৯ %এবং মোট জিডিপির ০.৭৫%, এবং এবারের প্রস্তাবিত ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের বাজেটে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৪১ লাখ ২ হাজার ৮শত ৯৭ দশমিক কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ১০.০৭% এবং জিডিপির ০.৬৭%। অথচ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় গৃহীত শুধুমাত্র চারটি দীর্ঘমেয়াদী নীতি-পরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি ২০০৯, ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০, জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা [ন্যাপ]-২০২৩-২০৫০, জাতীয়ভাবে স্থিরীকৃত অবদান [এনডিসি] ২০২১-২০৩০) বাস্তবায়নেই বার্ষিক ১৮.২৪ বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন। ২০৫০ সালের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বাংলাদেশের প্রয়োজন ৫৩৪ বিলিয়ন ডলার, অর্থাৎ বছরে ১৯.৭ বিলিয়ন ডলার সে বিবেচনায় এবারের বাজেটে জলবায়ু বরাদ্দ কতটুকু অগ্রাধিকার পেলো সেটাই প্রশ্ন ?

গত ৫ বছরের জাতীয় বাজেটে জলবায়ু বরাদ্দের চিত্র

অর্থবছর	চলতি মুল্যে জিডিপি[কোটি]	মোট জাতীয় বাজেট[কোটি]	মোট জলবায়ু বাজেট[কোটি]	জিডিপি'র % জলবায়ু বরাদ্দ
২০২১-২২	৩৯,৭১,৭১৬	৬০৩,৬৮১	২৮,০১০.১৩	০.৭১%
২০২২-২৩	৪৪,৯০,৮৪২	৬৭৮,০৬৪	৩২,৪০৮.৯০	০.৭২%
২০২৩-২৪	৫০,৪৮,০২৭	৭৬১,৭৮৫	৩৭,০৫১.৯৪	০.৭৩%
২০২৪-২৫	৫৫,৯৭,৪১৪	৭৯৭,০০০	৪২,২০৬.৮৯	০.৭৫%
২০২৫-২৬	৬২,৪৪,৫৭৮	৭৯০,০০০	৪১,২০৮.৯৭	০.৬৭%

তথ্যের উৎস: জাতীয় বাজেট ও টেকসই উন্নয়নে জলবায়ু অর্থায়ন বাজেট প্রতিবেদন ২০২১-২২ অর্থ বছর থেকে ২৫-২৬ পর্যন্ত ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রতিবেদন

১০. জলবায়ু বরাদ্দ ও টেকসই উপকূলীয় সুরক্ষায় আমাদের দাবী সমূহঃ

ক. টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অব্যাহত জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্থতার প্রসঙ্গিকতা বিবেচনায় রেখে, নিজস্ব সম্পদের উপর ভিত্তি করে গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে এবং জাতীয় বাজেটে জলবায়ু অর্থায়নের জন্য জিডিপির ন্যূনতম ৩ শতাংশ বরাদ্দ পুনর্বিবেচনা করতে হবে।

টেকসই জলবায়ু-সহনশীল বাংলাদেশ গড়তে একদিকে দুর্যোগ মোকাবেলার সক্ষমতা অপরদিকে মানুষের জীবন ও জীবিকা সুরক্ষায় অগ্রাধিকার ভিত্তিক বিনিয়োগ বড়াতে হবে। প্রতিবছর জিডিপির আকার বাড়লেও জাতীয় বাজেটে জলবায়ু খাতে বরাদ্দ বাড়েনি। কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, স্বাস্থ্য ঝুঁকি মোকাবেলা এবং পরিবর্তিত জলবায়ু পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে অভিযোজন সক্ষমতা অর্জন সহ দেশের বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর সুরক্ষায় গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পরিকল্পনার বিনিয়োগ চাহিদা অনুসারে জাতীয় বাজেটে জিডিপির কমপক্ষে ০৩% [১ লক্ষ ৮৭ হাজার কোটি টাকা] জলবায়ু অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

খ. উপকূলে দুর্যোগ সহনশীল পাথরের টেকসইবাঁধ নির্মানে গতানুগতিক বরাদ্দের বাহিরে পৃথক বরাদ্দ দিতে হবে

হচ্ছে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়। কিন্তু এই মন্ত্রনালয়ের জন্য প্রতি বছর যে বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হয় তা খুবই কম। ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের বাজেটে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জলবায়ু সংশ্লিষ্ট বাজেট বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে ৪ হাজার ৮ শত ২৩ কোটি টাকা, যেখানে চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বরাদ্দ ছিলো ৫ হাজার ৮৯ কোটি এবং ২৩-২৪ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট ছিলো ৫ হাজার ৪ শত ৪৯ কোটি টাকা। এই বরাদ্দ মূলত বাঁধ মেরামত ও ব্যবস্থাপনা খাতের জন্য হয়ে থাকে। বাঁধ নির্মানের জন্য তেমন কোন বরাদ্দ নেই। এই মুহুর্তে প্রায় ৬,৫০০ কি:মি: বাঁধ প্রয়োজন এবং সকল বাঁধ আগামী ১০ বছরের মধ্যে টেকসইভাবে নির্মান করতে হলে বিশেষজ্ঞদের হিসাবমতে প্রায় ১৩০,০০০ কোটি টাকা প্রয়োজন। যার প্রেক্ষিতে প্রতিবছর ১০০০০-১২০০০ কোটি টাকা পৃথক বরাদ্দ করা প্রয়োজন।পানি উন্নয়ন বোর্ডের সকল কাজে জনঅংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে ও পানি উন্নয়ন বোর্ডকে তার কাজের জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

গ. উপকূলে সুপেয় পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত উন্নয়নে অগ্রাধিকাভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে

বিশেষজ্ঞদের মতে, দেশের মোট জনসংখ্যার ৪১ শতাংশেরও বেশি এখনও নিরাপদ পানির সুবিধা থেকে বঞ্চিত; ৬১ শতাংশ বাড়িতে নিরাপদ স্যানিটেশন ব্যবস্থা নেই। বিভিন্ন বেসরকারি গবেষনা বলছে,উপকূলের ১.৫ কোটি মানুষ ভুগর্ভস্থ লবণাক্ত পানি পানে বাধ্য হচ্ছেন এবং বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন ও দিন দিন স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি বাড়ছে। প্রধান শিকার হচ্ছেন নারী, কিশোরী, শিশু ও বয়স্করা। উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের সুপেয় পানির সংকট দূরীকরণে জলবায়ু সহিষ্ণু লবণমুক্ত পানি শোধানাগার স্থাপন সহ অন্যান্য প্রযুক্তির সম্প্রসারণে সরকারকে উদ্যেগ নিতে হবে এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিক বরাদ্দ দিতে হবে।

কোস্ট ফাউন্ডেশন
ঠিকানা: মেট্রো মেলোডি, বাড়ী-১৩, রোড নং-০২, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭।